খেলনা, খেলনা-যাপন, নেপথ্য এবং...

অনিতেশ চক্রবর্তী

১.

বারান্দাতে পড়ে আছে কাঠের ঘোড়া।
তার পিঠে আজ চড়তে নারাজ তাতার ছোঁড়া–
বলে, ও তো ঠিক চলে না, দুলতে থাকে,
আর মারে চাট, যখন-তখন, দোলার ফাঁকে।
বুটছোলাগুড় যখন যা দিই–
খায় তো দেখি!
টগবগানো আওয়াজ শুনি রাতের বেলা,
দিনেই মেকি![১]

আমি তখন ছোট্ট। হাফ-প্যান্টুল বয়স। চেয়ারগুলো অনেক উঁচু। কোত্থেকে এখন খেলনা ঘোড়া এসে জুটল বাড়িতে। অনেক খেলনা ছিল। অনেক খেলনা ছিলও না। কিন্তু, ঘোড়াটা আমার আগডুম-বাগডুম সব সময়ে সঙ্গী। তখন, একা একা সদর দরজা ডিঙানো মানা। বাঘ, সিংহ, খোক্কস আর ছেলেধরারা নাকি ওঁত পেতে বাইরে। মা কিংবা ঠাকুমার হাত ধরে বেরোলে অবশ্য কাছে ঘেঁষে না কেউ। বাড়িতে সাদা-কালো টিভি। সেখানে মাঝে মাঝে রথ চলে। অর্জুন তীর ছোড়ে। কত হাতি, কত ঘোড়া। তা, আমারও এক ঘোড়া হয়েছিল। খেলনা তো কী! তখন দরজা জিঙোনো মানা, কিন্তু, আস্ত একটা ঘোড়া আছে আমার। পক্ষীরাজের গল্প শুনি রোজ। তেরো নদী, তেপান্তর। আমার ঘোড়ার পিঠে চেপেই দুলতে দুলতে সেই সব মাঠ, নদী হুশ... তারপর, ঘোড়াটা একদিন ভেঙে গেল। আর পিঠে নিতে পারল না আমায়। আমিও একদিন শৈশব ডিঙোলুম। বাড়ির দরজাও একা ডিঙোতে বাধা রইল না আর। খেলনা ছেড়ে খেলার দলে ভিড়লুম।

টগবগানো আওয়াজ শুনি রাতের বেলা
দিনেই মেকি!

শৈশব থেকে কৈশোর। খেলনাতে ধুলো জমে গেছে তদ্দিনে। তাও, কোনো কোনো নিময়ভাঙা রাতে, ঘুমের ঘোরে...ফিরে আসতে সেই দুপুর। দুলুনি। হরেক শব্দ। হরেক খেলনার। ছেলেবেলার।

খেলনাকে জাপ্টে শৈশব হয়। খেলনা নিয়ে ভাবা যায় তোয়াক্কাহীন। বড়দের চোখরাঙানির ভয় এড়িয়ে খেলনা নিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় যেদিক খুশি। সে এক আজব দুনিয়া। এর দরজায় খিল নেই। পা বাড়ানো যখন-তখন। যেমন খুশি অবাক হওয়া। কিচ্ছুটি প্রায় না বোঝার বয়স থেকেই শুরু। খেলনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বোঝা। তারপর, যা কিছু সব বিরাট, যা কিছু সব অসাধ্য প্রায়, অথচ যা বড়রা পায়, বড়রা পারে– সে সবই হাতের মুঠোয় আসে খেলনা-তে। খেলা বই তো নয়। তবু, খেলতে খেলতেই নতুন এক আজগুবি জগতের বৈতরণী পার হওয়া। কৌতূহল পেরিয়ে প্রথম শেখা নিজের মতো। খেলনা জানে সেই ইতিহাস। দিনের বেলায় কাঠের ঘোড়া, রাত্তিরে তাই টগবগিয়ে আসে। সে কথাটি শুধুই তার। বড়দের উঁকিঝুঁকি নেই সেখানে।

ছেলেবেলায় নিপাট যত্নের অত্যাচারে সাজানো থাকে হরেক খেলনা, হরেক পুতুল। খেলনা বিছে, টিকটিকি বা অ্যাম্বুলেন্স। ছোট্টটি জানে তাদের আলাদা আলাদা সর্বনাম। তাদের কেউ ছোটে, কেউ ঘোরে, কেউ আবার গানও গায়। কেউ মুখ ভোঁৎ করে ক্যাবলা দাঁড়ানো। কোনোটায় আলো জ্বলে, কোনোটা চাবি ভেঙে কানা। তাও, দুইটি টলমল পায়ে হেঁটে বেড়ানো শৈশব তাদের আঁকড়ে থাকে। জাপ্টে থেকে বড় হয়। পৃথিবীটা, তখন, প্রথমে খেলনা হয়েই আসে। সেই প্রথম চেনা। সেই খেলনাগুলোর অনেকটা হয়তো বড়দের চোখে ভাঙাচোরা, ফেলনা। তাও, তখন তার গোটা পৃথিবীটা জুড়ে নতুন শেকা একরাশ স্বপ্ন আর খেলনা।

মা বলেছেন, উনুনে ও জ্বলত ভাল।
বারান্দাময় আবর্জনার দিন ফুরাল।
ঘুমের মধ্যে কাঠঘোড়াটি দৌড়ে আসে–
'তাতার, তাতার' –এ-ফিসফাসে
কেউ জাগে না, তাতার জেগে ঘোড়ায় চড়ে।
পক্ষিরাজের ডানায় ওড়ে–
সমস্ত রাত, সমস্ত রাত, কী আহ্লাদে![২]

শৈশব যা ভাবতে পারে, পেতে চায় – খেলনাতে সে সব মেলে। সে এক আজব পাওয়া। গোটাভাবে পাওয়া। তবে সবটুকু ভাবতে পারা বা সবটুকু কল্পনাই কী ধরে ফেলা যায় খেলনাতে? থ্যাবড়া মত একটা ইঁটের ঢেলায় সে হয়তো খুঁজে পেলো কিছুর আদল। সেটা তখন দিব্যি হয়ে উঠল খেলনা। কিন্তু ধরা যাক সুকুমার রায়ের 'কিম্ভূত' সে পড়েছে–

'নাই ঘোড়া, নাই হাতি, নই সাপ বিচ্ছু,/ মৌমাছি, প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু!/ মাছ ব্যাঙ গাছপালা জলমাটি ঢেউ নাই,/ নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই'

ব্যঙ্গটি বাদ দিয়েও 'কিম্ভুত' বলতে সে যা বুঝছে তার কি খেলনা হয় কোনো? হয়না বোধহয়। তার মানে, খেলনা বাস্তবতা ডিঙোনো

এক স্বপ্ন-জগতের চাবি হলেও, তাকে কিন্তু হতেই হয় কোনো-না-কোনো 'ধরা ছোঁয়ার প্রতিরূপ'। ঐ যে আগে বললাম– যা বিরাট, অসাধ্য তাকেই 'নিজের মতো ছোট্ট' করে পাওয়া। আমার ছেলেবেলার সেই খেলনা রেলগাড়িটা যেমন। রেলগাড়ি কবে প্রথম চড়েছিলাম মনে নেই। মোদ্দায় একটা ইয়াব্বড় গাড়ি। ঘরের পর ঘর যেন চাকা লাগানো। তার মধ্যে আমিটা এত্তেটুকুন। সেই রেলগাড়িটা একদিন খেলনা হয়ে এল আমার বাড়িতে। আমার থেকেও এত্তোটুকুন হয়ে। । আর ভিতরে একদিন খুব ছোট্ট ছিলাম, সেটাই এখন আমার হাতে ঘুরতে লাগল ঘরময়। সে এক দারুণ মজার ব্যাপার। খেলনাতে তো এ-সব কিছুই মেলে। দুয়োরাণির ছেলে নেই। মনে দুঃখ খুব। তখন রাণি ক্ষীরের পুতুল দিয়ে সন্তুষ্ট করলে ষষ্ঠী - ঠাকরুনকে। তারপর, টুকটুকে এক ছেলে পেল দুয়োরাণি। পুতুল কিংবা খেলনা গাড়ি– স্বপ্নপূরণের নামতা মিলতে মিলতে যায় এভাবেই।

ছোট্ট মনেরা ছোট্ট খেলনার মধ্যেই বুঝে ফেলে বড় পৃথিবীটাকে। খেলনা এইভাবে কখন যেন একটা সেতু হয়ে পড়ে। ছোট থেকে বড়-র সেতু। সেই সেতু ধরে হাঁটাতে হাঁটতে এক সময় বয়সের এইপারে এসে থামে শৈশব। খেলনা গাড়ি, বাড়ি, পুতুলগুলো তখন বড় হতে হতে বিরাট। আর টলমলে পায়ে হাঁটতে থাকে সেই ছোট্টটিও তখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে – তার মুখভর্তি দাড়ি - গোঁফ কিংবা মাথাভর্তি লম্বা চুল। এক সময় তার রাতের ঘুমে পক্ষীরাজ। এক সময় তার খেলনা মাখানো স্বপ্ন...

কেউ জাগেনা, তাতার জেগে ঘোড়ায় চড়ে।
পক্ষিরাজের ডানায় ওড়ে–
সমস্ত রাত, সমস্ত রাত, কী আহ্লাদে।
কিন্তু, কে যে কোথায় কাঁদে,
কিন্তু, কী যে কোথায় কাঁদে![৩]

বয়স বাড়লে খেলনার বয়স ফুরোয়। খেলনা পুরোনো হয়। ফুরোনো হয়। ছেলেবেলার 'না জানার' আশ্চর্য জগৎটা তখন অদ্ভুতুড়ে স্বপ্নে আসে না। খেলনারা কিন্তু জানে এই বড় হয়ে ওঠার ইতিহাস। খেলনারা জানে এরপর তাদের থাকতে হবে ধুলো মেঘে আস্তাকুঁড়োয় ফেলনা হয়ে।

কিন্তু, কে যে কোথায় কাঁদে,
কিন্তু, কী যে কোথাঁয় কাঁদে!

২.

...জীবন জীবনব্যাপী মজুরী যোগার হেরাফেরী টেংরি নাই, জুস নাই, কাঁহা কুচ্ছু নাই, নীলাচলে খাটতে কাটতে জান নিকলে যায়, তবু দম দেওয়া পুতুল পিছনে পিছনে ছোটে, ঘন্টি মারে : 'হো নও জোয়ান!'[৪]

পুতুল। খেলনা পুতলু। দম দেওয়া। 'পুতুল নেবে গো'... পুতুল নিয়ে আমাদের খেলা। অথচ আমরাই কখনো - কখনো ... আমরাই রোজ, প্রতিনিয়ত ...দম দেওয়া পুতুল। খেলার পুতুল। খেলনা।

১৯৫৯ সাল। মার্কিন কোম্পানি ম্যাটেল ইঙ্ক জন্ম দিল আরেক পুতুলের– বার্বি। একটি যুবতী। সোনালী চুল। চিকন ত্বক। চেহারার গড়নটি তাক লাগানো। প্রথম বার্বির পরনে ছিল একটি ওয়ানপিস স্যুইম স্যুট। পুতুল-জগতে বার্বির এহেন আগমন বেশ সাড়া ফেলে দিল। শিশুদের খেলনা যে পুতুল –তার এমনতরো গড়ন! বার্বি এক বিস্ময় তখন। উন্মাদনা। তা, হঠাৎ বার্বি এল কীভাবে? রুথ আর এলিয়ট হ্যাণ্ডলার –এক মার্কিন দম্পতি। তাদের মেয়ে বারবারা। এলিয়ট ম্যাটেল ইঙ্ক কোম্পানির কর্ণধারদের একজন। রুথের ইচ্ছে, এমন এক পুতুল বানানোর যা কেবলমাত্র শৈশবের প্রতিবিম্ব হবে না। কেমন হলে তাহলে? অনেকটা বাইল্ড লিলির মতো। লিলি - একটি জার্মান পুতুল। সোনালী চুলের এবং যুবতীও। বেশ নজরকাড়া চেহারা। সে নাকি চাকরি করে, পুরুষদের সঙ্গে ফ্লার্টেও স্বচ্ছন্দ– এমনটাই দাবি তার প্রোফাইলে। এহেন লিলিকে দেখেই রুথের কল্পনা জন্ম দিল বার্বির। মেয়ের নামের সঙ্গে মিল রেখে নাম। তারপর– বাকিটা ইতিহাস।

পুতুলের চেনা সংজ্ঞাটাই বদলে দিল বার্বি। শৈশবের সারল্য টপকে বার্বি তখন এক অন্য আকর্ষণ। এক উদ্দাম জীবনের চাবিকাঠি তার হাতে। বার্বি তখন রীতিমতো রোলমডেল। সারা বিশ্ব বুঁদ তার নেশায়। তার জীবন-যাবনের তথ্যও সদ্য শৈশব পেরোনো থেকে কিশোরী – সবার মুখে মুখে ঘোরে, বার্বি জীবন উদযাপন করতে ভালোবাসে, অঙ্ক করতে ভালো লাগে না তার। তার সাজ, ত্বক, ফ্যাশন তদ্দিনে নকল করতে শুরু করেছে অনেকেই। এমনকী বার্বির দেখাদেখি মেয়েদের অঙ্ক না শিখলেও চবে – এহেন ভাবনাও বেশ জনপ্রিয়। নিন্দুকেরা বললেন, বার্বির গড়ন অস্বাভাবিক। সে অত্যধিক রোগা – অ্যানেস্কোরিয়ার রোগী। কে শোনে কার কথা! বার্বি তখন স্টাহল আইকন। তাকে দেখেই নিজেদের সাজাতে ব্যস্ত কচি কচি মেয়েরা।

বার্বি বিশ্বজয় করলে অতি দ্রুত। আফ্রিকান বার্বিও বেরোলো। রং কালো – অথচ মুখের আদল ককেশিয়ানদের মতোই। বার্বির জনপ্রিয়তার কোনো খামতি নেই। খামতি নেই বার্বিকে দেখে নিজেকে সাজানোর উদ্দীপনায়।

মানুষ-এরই নকলে পুতুল তৈরি হতে অ্যাদ্দিন। এবারে, পুতুলকে দেখে নিজেদের সাজাতে চাইল মানুষ? মানুষ নিজেই পুতুল হলো। আড়ালে কারা যেন হাসল। বাজারের কাছে তখন পুতুল – শৈশব। ভোগবাদী ব্যবস্থাটাও এই সুযোগে দুদ্দাড় ঢুকে পড়লো কচি মগজে। পুতুল বানানোর এমন সুযোগ ছাড়ল না সেও। জ্যান্ত পুতুল।

পুতুল নিয়ে শৈশব খেলতো। হরেক পুতুল। ছোট পুতুল। বড় পুতুল, বুড়ো পুতুল, বর-বউ, শ্রমিক পুতুল, চাষী পুতুল। পুতুলদের ছুঁয়েই বড় জীবনটাকে জানা হয়ে যেত অনেকটা। পুতুল নিয়ে নানান খেলা। খেলনা পুতুল।

তাবলে, মানুষের নিজেরই পুতুল হবার, খেলনা হবার ইতিহাসটাও কিন্তু আজকের না। খেলনা তৈরি করতে করতে খেলনা নিয়ে খেলতে খেলতে মানুষ নিজেই কখন খেলনা হয়ে যায় অজান্তে। খেলনা করে তুলতেও চায় অন্যকে। পুতুল যে বানায় – সেও আসলে পুতুল।

সুতো বাঁধা উপরে কোথাও। সুতো ছেঁড়ার ক্ষমতা তার নেই। তাই, তার আজীবন পুতুল–যাপন, খেলনা-যাপন। এ এক অসহায় মজার নামতা।

'খেলনা' শব্দটার আড়ালে আসলে একইসঙ্গে থেকে যায় 'আধিপত্য' এবং 'অসহায়তার' চোরা গন্ধ। খেলনার উপরে খুব সহজেই কর্তৃত্ব চাপানো যায়। কর্তৃত্বের কাছে খেলনা অসহায়। শৈশবের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে থাকা এ শব্দ তখন এক অন্য ইতিহাসের কথা বলতে যায়। ক্ষমতার এবং পরাজয়ের ইতিহাস।

সময় বদলায়। কিন্তু, মানুষের খেলনা হবার ইতিহাস বদলায় না। মানুষকে খেলনা বানায় কে? অন্য মানুষ? ঠিক। মানুষ তো মানুষকে খেলনা বানায়ই, তবে, খেলনা বানায় ব্যবস্থাটাও। তার কাছে তো সবাই পুতুল। আগে দাস ছিল প্রভুর পুতুল। আঙুল হেলতে হেলতেই হুকুম তামিল। তারপর, ধীরলয়ে সামন্ততন্ত্র। ব্যবস্থার হাতে এখানেও পুতুল– মানুষ। পুঁজিবাদ এল এরপর। এখানে মানুষের আপাত স্বাধীনতা বেশি। এখন 'গণতন্ত্র' নামের গালভরা শব্দটি ইষ্টনাম জপের মতো জপ করা হয় রোজ। কিন্তু, এখানেও সেই পুতুল হওয়া। একদিকে মুনাফার বাজার, অন্যদিকে রাষ্ট্র নামক যন্ত্র– দু'দিক থেকেই সুতোয় বাঁধা মানুষ। আজব ফাঁদ। ব্যবস্থা মানুষকে খেলনা বানায়, ব্যবস্থাই আবার ঠিক করে দেয় কোন খেলনার নেশায় সবাই বুঁদ হয়ে থাকবে। কে, কোন খেলনায় খেলবে সে-কথাও ঠিক করে দেয় ব্যবস্থা। এক এক্কে এক ... দুই এক্কে দুই ... খেলনার বাজার বাড়ে। যা বেচা হয় সেটাও খেলনা, যে কেনে সেও।

খেলনা হওয়ার ভিতরেও অনেক সিঁড়িভাঙা অঙ্ক। নিজে পুতুল, তাও অন্যকে পুতুল বানায় কেউ। আসল চিত্রনাট্য কিন্তু অন্যত্র লেখা। আগেই বললাম– কে কোন খেলনায় খেলবে সে কথাও ঠিক করে রাখা। এর মধ্যে দিয়েও আসলে খেলনা - প্রাপ্তির বৈচিত্র্য বাড়ে। যেমন ধরা যাক মেয়েরা, সিঁড়িভাঙা অঙ্কের একদম শেষের দিকের ধাপ। খেলনাবাটি, পুতুলের বিয়ে থেকে অধুনা বার্বি। কেমন এই খেলনা মেয়েদের? আসলে, মেয়েরা হয় ঘর সামলাবে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে অথবা তারা– ভোগবাদ থুড়ি পুঁজিবাদ মেয়েদের পণ্য ভাবে। পণ্য তার কাছে সবাই প্রায়। তবে, বাজারে 'মেয়ে' পণ্যই চলে ভাল। তাই, গ্ল্যামারের নামে মোহময়ীরূপে চাই মেয়ে সাপ্লাই। এর শুরুটা ঐ খেলনা দিয়েই। বার্বি বা ঐ সব পুতুল নিয়ে খেলতে খেলতেই শিশুমনে লেখা হয়ে যায় ভূমিকাটুকু। তারপর তো তার নিজেরই পুতুল হয়ে ওটা। বাজার ফুলে - ফেঁপে ওঠে। পুতুলের ব্যবসা বাড়ে। পুতুলের সংখ্যাও বাড়ে।

উল্টোদিকে, ছেলেরাও দিব্যি পুতুল হয়। খেলতে খেলতেই হয় নানাভাবে। মগজধোলাই। 'হীরক রাজার দেশে' -তে যন্তরমন্তরের সেই মন্ত্র মনে পড়ে? ছাত্রদের মগজে ঢোকানোর চেষ্টা চলেছিল যা:

পড়াশোনা করে যে
অনাহারে মরে সে
জানার কোন শেষ নাই
জানার চেষ্টা বৃথা তাই...

ছাত্ররা মুখ্যু হয়ে থাকলে হীরক রাজের পোয়া বারো। না পড়লে ঠিক-ভুলের হিসেব বুঝবেনা তারা। প্রতিবাদ করবে না। চোখ বুজে ভক্তি-ভরে বলবে– 'হীরকের রাজা ভগবান'। আর কী চাই! তবে, যন্তরমন্তর তো থাকে না সর্বত্র। তাই এ হেন পুতুল বানানোর কারখানা তখন পন্ডিতের টোল, আজকের ভাষায় স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি। 'মুক্তধারা'য় তাই পন্ডিত ছাত্রদের বলতে শেখান – 'শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী উত্তরকূটাধিপতির জয়...'। শিবতরাইকে জব্দ করা দরকার, ওদের ধর্ম খারাপ–সব গেঁথে যায় শিশু মগজে। শাসক বেজায় সুখি। হ্যাঁ-তে হ্যাঁ, না-তে না মেলবার হরেক পুতুল চারপাশে। যোগান ভালোই। তার ওপর, ছেলেরা খেলবে যুদ্ধাস্ত্রের খেলনা নিয়ে। বন্দুক, খেলনা এয়ারগান, খেলনা ট্যাঙ্ক, পেশী-বহুল র‍্যাম্পে-পুতুল আরো কত কী! খেলতে খেলতে অবচেতনে নিজেও যুদ্ধে সামিল হবে সে। একের পর এক শত্রু মারবে। তাতেই অদ্ভুত আনন্দ। শিশুমনটা এভাবেই কখন আশ্চর্য কাঠিন্য পেয়ে যায়। সেনাবাহিনীর গুলিতে লোক মরলে তখন তার যায় আসে না কিচ্ছু। উল্টে সেও চেঁচায়– মারো মারো। কারা যেন আড়াল থেকে হাততালি দেয়। পুতুল বাড়লো, পুতুল বাড়লো।

খেলনার ঐ পাশে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে কর্তৃত্বের বোধ। চারপাশে, ভিড় করে থাকে দম দেওয়া পুতুল। দম দেওয়া খেলনা। আমি চাবি ঘোরালে ঘুরবে, নাচবে, হাততালি দেবে, গানও গাইতে পারে। সবই চলবে আমার ইশারায়। এক চুলও অন্যথা করবে না আমার নির্দেশ। চলতে চলতে একদিন খারাপ হয়ে যাবে। ফেলে দেব সেই খেলনা। নতুন খেলনা আসবে। ফের চাবি ঘোরাব। আমি হাসব। আনন্দে হাততালি দেব। আমার খেলনা। আমার দম দেওযা পুতুল।

ব্যবস্থাটা এভাবেই কখন আমার মধ্যেও ঢুকে পড়ে। আমি তখন ব্যবস্থাটার প্রতিরূপ। নিজে আধিপত্যের পুতুল হয়েও আধিপত্যের নেশায় বুঁদ। ব্যবস্থাটা এভাবেই নিজেকে গুছিয়ে নেয় নিরাপত্তার বলয়ে। তাকে ভাঙবে কারা? আমরাই তো এক একটা খুদে ব্যবস্থা হয়ে বাঁচি, সব সয়েও – মগজধোলাই।

বাজার - ক্ষমতা - আধিপত্য-রাষ্ট্র – এদের হাতে খেলনা আমরা সব্বাই। আমাদের সব প্রবৃত্তি নিয়ে আমরা খেলনা খুঁজি। খেলনা হই। বাজার 'সেক্স ডল' দেদার বিকোয়। যৌনতার খেলনা। যেমন খুশি ভোগ করো একে। মানুষ পুতুলের আজব সহবাস। মজার ব্যাপার।

খেলনা নিয়ে খেলতে খেলতে আমরা খেলনা গড়ে নিতে চাই প্রতিনিয়ত। খেলনাতেই বাঁচা অভ্যেস আমাদের। প্রেমিকটি তাই প্রেমিকার অগোচরেই গোপনতম মুহূর্তের ছবি তোলে। প্রেম তখন খেলনাবাটির নামান্তর। প্রেমিকটির ইচ্ছেতেই খারাপ লাগা, ভালো লাগার সংজ্ঞা বদলায় মেয়েটির নিজেকে মনে হয় কাঠের পুতুল। খেলনা। আর ছেলেটি? সেও তো...কে যে আসলে খেলায়? কে যে আসলে খেলে?

খেলনার নামতা বেড়েই চলে, বেড়েই চলে। ছোট্টটির সঙ্গে লেপ্টে থাকে এই শব্দটা তখন প্রতিটি গলিতে - ঘুঁজিতে। রাস্তায়। মনের কিলবিলে পোকার ভিতরেও ঢুকে পড়ে ক্রমশ। আমরা পুতুল খেলি। পুতুল হই। আড়ালে অনেকে উল্লাসে মাতে। তারা চায় আমরা পুতুল হয়ে বাঁটি। খেলনা হয়ে বাঁচি। তা হলেই তো যা-ইচ্ছে তাই ঘটানো যাবে অনায়াসে। কেউ টুঁ শব্দটিও করবে না।

কিন্তু, এই জ্যান্ত পুতুলেরাও কখনও কখনও সুতো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। চায় পুতুল - যাপন থেকে মানুষে ফিরতে। নোয়া তাই বেরিয়ে আসে জল্‌স্ হাই ছেড়ে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কৈফিয়তেও তাই মানিক বলেন, এই উপন্যাস নিয়তির হাতে পুতুল হবার নয়, বরং

এতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটার হাতে, 'কিছু মানুষের হাতে পুতুল হবার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ স্লোগানের বদলে সাহিত্যের মাধ্যমে রূপ নিয়েছে।'[৫] 'কাঠেরপুতুল' হয়ে পড়া মেয়েটিও তাই প্রতিবাদ করে আজ। আরো অনেক করে। খেলনা না, বাঁচার লড়াই লড়ে মানুষই। গত শতাব্দীর শুরুতে মানুষ পেরেছিল একবার। তারপর, সেই চেষ্টা ভেঙে গেছে। কিন্তু, খেলনা না হওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে এখনও। মার্কিন কোম্পানি ম্যাটল ইঙ্ক-এর দেশেও চলছে। ব্যবস্থাটাকে উপড়ে ফেলতে চায় মানুষ। স্লোগান উঠেছে–'I am not antisystem. The system is anti Me.'। খেলনা হয়ে বাঁচার দিন তবে কি শেষ হবে এবার? প্রশ্ন অনেক। ইতিহাসই উত্তর দেবে তার।

৩.

একটি ছেলে। ছোট্ট। বিরাট বাড়িতে একা। ঘর ভর্তি সাজানো পুতুল, অনেক খেলনা। ছেলেটার মাথায় কান-দেওয়া টুপি। দম দেওয়া পুতুল সারি সারি সাজানো। রোবট। ছেলেটি একা থাকে সারা দুপুর। ফ্রিজ খুলে আপেল নেয়। দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে বেলুন ফাটায়। আর খেলনা নিয়ে থাকে। সমস্ত চাবি দেওয়া পুতুলগুলোর চাবি ঘুরিয়ে দেয় একসাথে। কেউ ড্রাম বাজায় কেউ মাথা দোলায়। ছেলেটির মজা লাগে। মজা লাগে?

জানলার ঐপার থেকে হঠাৎ বাঁশির শব্দ আসে। ছেলেটি জানলার কাছে যায়। ঐ পারে অনেক উঁচু উঁচু সবুজ ঘাস। তারই মধ্যিখানে একটা রোগা, হাড় জিরজিরে ছেলে। পাশে তার ভাঙাচোরা ঝুপড়ি। বাঁশি বাজাচ্ছে আনমনে। ঘরের ছেলেটির মুখে এক মুহূর্তের জন্য স্নিগ্ধ হাসি খেলে। তারপর, কঠিন হয় মুখ। একটা বেসুরো বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ এবার থামিয়ে দেয় কালো ছেলেটির বাঁশি। মাথা উঁচু করে সে অবাক হয়ে দেখে সেই পেল্লাই বাড়ি। জানলায় দাঁড়ানো তারই সমবয়সী একটি ছেলে। উল্টোদিকে একা ছেলেটি ভাবে সে জিতেছে। তার খেলনা জিতেছে। এরপর, ঝুপড়ি থেকে একটা মাদল নিয়ে আসে কালো ছেলেটি। লাফাতে লাফাতে। উল্টোদিক থেকে দম দেওয়া দামি পুতুল। চাবি ঘোরালে সেই ড্রাম বাজায়। কালো ছেলেটি ফের হারে খেলনার কাছে। এবার সে আসে একটা মুখোশ পরে। তীর-ধনুক হাতে। বড় বাড়ির ছেলেটি এরপর বার করে তার হাজারো মুখোশ। বন্দুক, তরবারি নিয়ে নানা সাজে সেজে সে এসে দাঁড়ায় জানলার সামনে। কালো ছেলেটির অত মুখোশ নেই। অত রঙ নেই খেলনার। এই প্রাচুর্যের কাছে হেরে মিয়োনো মনে সে মাথা কিছু করে ফিরে যায় তার ঝুপড়িতে।

একা ছেলেটি এ খেলায় জিতেছে। তার অনেক খেলনা। জিততে তাকে হতোই। জিততে তাকে হবেই। জিতেওছে। সে ফের ঘরে ঢোকে। রোবট চালায়। হঠাৎ, চোখ যায় জানলার ঐপারে। একটা ঘুড়ি উড়ছে। সেই কালো - রোগা ছেলেটাই আবার ...মুখ কঠিন হয় বড় বাড়ির ছেলের। তার কোনো খেলনা তো উড়তে পারে না। কিন্তু, জিতে তাকে হবেই। সে গুলতি আনে। তাক করে ঘুড়িটায়। পারে না। গরীব কালো ছেলেটি সারহ্যের হাসি হাসে। একমনে ঘুড়ি ওড়ায়। এবার এয়ারগান আনে বড়লোকের ছেলে। ঘুড়িটায় গুলি লাগে। কালো ছেলেটি অসহায় বিস্ময়ে জানালার দিকে তাকায়। সেখানে একজন জেতার আনন্দে হাসছে। তারপর, চোখটা হালকা রাঙিয়ে সে ঘরে ঢোকে। যেন, সাবধান করে দেয় গরীব ছেলেটিকে। ঘুড়িটাকে গুটিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে যায় সেই ছেলে।

বড়লোকের একা ছেলে। দস্যি ছেলে। সে জিতেছে। তার অনেক খেলনা। খেলনা নিয়ে প্রতিযোগিতায় সে হারবে কেন? রোবট চালাতে চালাতে সে আবার জানলার বাইরে তাকায়। সেই বাঁশির সুরটাই কি ফের...? জানলাটা ঝাপসা হয়ে আসে। ছেলেটি কাঁদছে। সেই কি হেরে গেছে তবে?

সত্যজিৎ রায়ের ছোট আয়তনের নির্বাক ছবি 'টু', দুটি সমবয়সী শিশুর গল্প। একজন উঁচুতে থাকে। অন্যজন নিচুতে। একজনের অনেক খেলনা, আরেকজনের খেলনা বলতে বাঁশি, মাদল, মুখোশ আর ঘুড়ি। একজন খেলতে খেলতে জিততে চায়, অন্যজন খেলার আনন্দে খেলে, হেরেও যায়। কিন্তু, কে হারে আসলে? অনেক প্রশ্নের উত্তর লুকোনো থাকে এই নির্বাক সিনেমাটিকে। নির্বাক– অথচ 'খেলনা রাজনীতির' কত কথাই না বলে যায় এই সিনেমা। কৈশোরের একাকিত্ব – খেলনা – দম দেওয়া পুতুল – প্রাচুর্য – আধিপত্য – জয়ের নেশা – কত কী বলে যায় 'টু' সিনেমাটির প্রতিটি দৃশ্য।

অপু খেলত মহাভারতের এক কল্পিত পৃথিবী গড়ে। তীর-ধনুক-তরবারি হাতে। রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের খেলনা বলতে ছিল একটা প্রকান্ড গাছের গুঁড়ি। তাকে ঠেলা মেরে গড়িয়ে দিয়েই কত সুখ, কত পাওয়া।

একটি ছেলের হরেক খেলনা। থরে থরে সাজানো পতুল। খেলনা জাপ্টে শৈশব বড় হয়। নিস্পাপ সারল্যের গন্ধ্য মাখানো সেই খেলনা-বয়স। খেলতে-খেলতে রাত্রিবেলায় হয়ত পক্ষীরাজ ...অথচ, দম দেওয়া পুতুল, মুখোশ, এয়ারগানের মধ্যিখানে থাকা ছেলেটি আসলে জিততে চায়। খেলনা নিয়ে জিততে চায়। খেলতে খেলতেই তার মনের পৃথিবীতে যুদ্ধ জারি হয়ে গেছে। একটা ছোট্ট ছেলে – অনেক খেলনা – খেলতে খেলতে জিততে চায় শুধু। মুখ কঠিন হয়। তার শৈশব ঘেরাটোপে বন্দি। খেলনার ঘেরাটোপ। দম দেওয়া খেলনা। তা ছুঁয়ে কী শেখে ছোট্ট মন? কিন্তু, জানলার ঐপারে তাকালে...ঐপার থেকে রোগা-কালো ছেলেটা একমানুষ উঁচু ঘাসে ঢেকে থেকে ঘুরে বেড়ায়। বাঁশি বাজায়, মাদল বাজায়। মুখোশ নিয়ে খেলে। ঘুড়ি ওড়ায়। তার প্রকৃতি জুড়ে জড়িয়ে থাকে খেলা। খেলনা। আধপেটা খাওয়া ঘুমেও তাই সেইসব খেলনার পৃথিবীরা নিবিড় স্বপ্ন নিয়ে আসে। আর, সেই বড়লোকের একলা ছেলেটি?

কিন্তু, কে যে কোথায় কাঁদে,
কিন্তু কী যে কোথায় কাঁদে!

তথ্যসূত্র:

১। কাঠের ঘোড়ার গপ্পো। মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়

২। ঐ

৩। ঐ

৪। প্রলাপ লিখন। আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো। জয় গোস্বামী।

৫। গ্রন্থ পরিচয়, পুতুল নাচের ইতিকথা, পৃ: ২২৩; ১৪১৩ ফাল্গুন।